দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

11 JUL 1989
কলাম 5

055

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ মঙ্গলবার, ২৭ আষাঢ়, ১৩৯৬

জীবন নিয়ে খেলা

গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ বিলম্বিত হচ্ছে। জানা গেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক হারে অকৃতকার্য হওয়াই এই বিলম্বের কারণ। প্রকাশিত খবরে নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাদ দিয়ে জানানো হয়েছে, কোন গ্রেস ছাড়া ঢাকা বোর্ডে কলা বিভাগে পাসের হার শতকরা ১২ থেকে ১৪ এবং অন্যান্য বিভাগেও এই হারের তফাত খুব একটা নেই। অপর তিনটি বোর্ডের অবস্থা একই। বলা হয়েছে, এবার নকল বিরোধী ব্যাপক তৎপরতার দরুন পাসের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। যা হোক, জানা গেছে, পাসের হার সহনীয় পর্যায়ে আনার জন্য যেসব ছাত্র সর্বমোট ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়েও কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে— কর্তৃপক্ষ তাদের ১০ নম্বর গ্রেস দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরপরও যারা পাস নম্বরের পর্যায়ে উঠতে পারবে না—তাদের কম্পার্টমেন্টালের সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে, যারা সর্বমোট ৫০ শতাংশ নম্বর পায়নি—তাদের ক্ষেত্রে এই দু'টি সুযোগের কোনটিই প্রযোজ্য হবে না। খবরে একটি সূত্রের বরাদ দিয়ে বলা হয়েছে, এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ৪টি বোর্ডে পাসের হার শতকরা ৪০ থেকে ৫০-এর মাঝামাঝি দাঁড়াতে পারে।

পরীক্ষা নিয়ে দুর্নীতি নতুন কথা নয়। পরীক্ষায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা—এমনকি প্রয়োজনে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন বা সংশোধনের বিষয়েও কম গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। পরীক্ষা পিছানো এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের ঘটনাও এ দেশে কম ঘটেনি। এবার এসএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতি অর্থাৎ নকল দমনের জন্য কড়া পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। ফলে, পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বোমা, অগ্নিসংযোগ, গুলী এবং গ্রেফতারের ঘটনাও অনেক ঘটেছে। এখানে উল্লেখ্য, এবার চারটি বোর্ডেই পরীক্ষা পাসের হার যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে—শোনা যাচ্ছে এর কারণ হল পরীক্ষায় দেদার নকল হওয়ার জন্য পরীক্ষকগণ নাকি একটু বেশী কড়া মেজাজ নিয়ে খাতা দেখেছেন। এ নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের মধ্যেও নাকি অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। আর এর প্রেক্ষিতেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ উপরে উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এসএসসি পরীক্ষার ফল 'সহনীয়' পর্যায়ে উন্নীত করা এবং ফল প্রকাশে বিলম্ব রোধ করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ স্বাভাবিক পদক্ষেপ হিসেবেই গণ্য হতে পারে। তবে যারা শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর পায়নি এবং একটি বিষয়ে পাস নম্বরও পায়নি তাদের ভবিষ্যতের প্রতি মনোযোগী হওয়া যায় কি-না তা ভেবে দেখতে পারেন কর্তৃপক্ষ। কারণ, পরীক্ষকগণ যে কড়া মেজাজ নিয়ে খাতা দেখেছেন—তার প্রতিক্রিয়া সকল পরীক্ষার্থীর উপরই সমভাবে পড়বে এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সর্বমোট শতকরা ৫০ ভাগের উপর নম্বর যারা পেয়েছে—তারাই শুধু কর্তৃপক্ষীয় বিবেচনা পাবে—বাকীরা পাবে না—এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে বলে আমরা মনে করি।

সব ছাত্র-ছাত্রীই পরীক্ষায় নকল করে— একথা কি কেউ বলতে পারেন? তাছাড়া, একজন পরীক্ষক স্বাভাবিক মেজাজ নিয়েই পরীক্ষার খাতা দেখবেন—এটাইতো স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে হয়, পরীক্ষার্থীদের একটি অংশের মধ্যে নকল করার প্রবণতা কেন সৃষ্টি হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ফেল করে কেন?

কিন্তু তার পরও ফেল নামের একটি আতংকের তাড়ায় কিছু কিছু ছাত্র যে বিপথে অর্থাৎ দুর্নীতির পথে যেতে পারে না তা কি জোর দিয়ে বলা যায়? ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় ফেল করার কারণটি কেন তাদের পেছনে লেগে থাকে—এ প্রশ্নটি কি কখনো যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়েছে? হলে নিশ্চয়ই বিদ্যালয়ে পাঠদান পদ্ধতিকে সকল ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় পাস করার অনুরূপ রূপ দেয়া হতো। অর্থাৎ, মেধার তারতম্য লক্ষ্য করে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা পাসের উপযোগী করে তোলার জন্য যথা প্রয়োজন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো। এবং প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষা ও কর্ম সংকুচিত করে রাখার লক্ষ্যে চালু পরীক্ষা পদ্ধতিরও প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হতো। আজ যে শিক্ষকগণ ছাত্রদের পরীক্ষার জন্য সেন্টআপ করেন, যে পরীক্ষকগণ 'কড়া মেজাজ' নিয়ে খাতা দেখেন—তারা এ ব্যাপারে কি বলবেন জানি না; তবে, আমরা মনে করি, ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নিয়ে খেলা করার এই পরিস্থিতির মূল উৎপাটনের স্বার্থেই পুরা বিষয়টি পর্যালোচিত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।